দৈনিক সংবাদ

C55

তারিখ 23 JUN 1987 পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

সময় বহিয়া যায়

গাছপাথর

এই কলামে আমি ইলা মিত্রের কথা লিখেছিলাম। স্থানাভাব ছিলো তাই তাঁর একটা অভিজ্ঞতার কথা লেখা হয়নি। সেটি শিক্ষা-সংক্রান্ত, এবং শিক্ষামূলক। ইলা মিত্র তাঁর এলাকার মেয়েদের স্কুল খুলেছিলেন গরীব মানুষদের জন্য। সেখানে আগে কোনো স্কুল ছিলো না। জমিদাররা চায়নি, জোতদাররা চায়নি। সাত মহলার জমিদার বাড়িতে বন্দিনী হয়ে থাকতে প্রস্তুত ছিলেন না ইলা মিত্র, তাই তিনি বেরিয়ে এলেন, স্কুল খুললেন, সেই সাতচল্লিশেই। এবং সঙ্গে সঙ্গে জমি জমার মালিক যারা, উপরতলার মানুষ, তারা লাগলো তাঁর পেছনে। ''কুকুরের মতো মাটি শুঁকতে লাগলো তারা।'' বললো, স্কুল শরিয়ত-বিরোধী, ওখানে নিয়ে বে-পর্দা করা হচ্ছে মেয়েদেরকে, মেলচ্ছ করে তোলা হচ্ছে। এসব চলবে না। তখন গ্রামের সাধারণ, অশিক্ষিত মানুষেরা জড়ো হলো পৃথক সারিতে আরো বড়ো সমাবেশে। ইলা মিত্র লিখছেন, ''জমিহীন, কপর্দকহীন এবং নিজে সম্পূর্ণ অক্ষরজ্ঞানশূন্য ক্ষেতমজুর ওয়াজেদ মোড়ল বালিকা বিদ্যালয়ের বিতর্কের জনসভায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঐ যে আমিনা বিবি মিয়া পাড়ায় সাহেবদের খামারে বাঁদীগিরি করে সে বুঝি মুসলমান নয়। নদীর পানি টেনে সাহেবদের স্ত্রীদের জন্য যারা গোসলের পানি যোগায় সেই মুসলমান মেয়েরা আল্লার কাছে বুঝি সম্পূর্ণ অস্পৃশ্য।'''

ঘটনা কিন্তু ওখানেই থেমে থাকেনি। এগিয়েছে তার পরেও। দেখা গেলো ওই যে ঝগড়া মেয়েদের স্কুল নিয়ে তা নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত হচ্ছে। ''গরীবের দল হেঁকে বললো, 'সুদ খাওয়া হারাম'। দিকে দিকে ওই প্রচার ক্রমে ক্রমে দাবানলের সৃষ্টি করল।''

ভয়টা ওইখানেই। শুরু হলে থামে না, নতুন নতুন বাঁক নেয়, নব নব দিগন্তে প্রসারিত হয়ে পড়ে। একটা থেকে জন্ম হয় আরেকটার। সৃষ্টি হয় দাবানলের। এ জন্যেই বাধা দেওয়া, মাটিতে গন্ধ শোঁকা।

বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসারের বিরুদ্ধে পরামর্শ শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কও দিলেন কিনা বুঝলাম না, তবে তাঁরা সরকারী বিদ্যায়তনে ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি করার পরামর্শ যে দিয়েছিলেন সে খবর কাগজে এসেছিলো, এখন বাস্তবেও দেখা গেলো কাজ ওই মতোই হয়েছে, দ্বিগুণ হতে যাচ্ছে। এর পক্ষে যুক্তি আছে : সমতা আনা। প্রাইভেট স্কুলে বেতন বেশি, সরকারী স্কুলে কম—এটা বৈষম্যমূলক। সাম্য আনা প্রয়োজন, এখানে বেড়ে আছে, ওখানেও বাড়াও। সরকার মনে হয় সমাজতন্ত্রী, সাম্য চান। তবে সাম্য বোধ করি দুই প্রকারের—একটি সুখের সাম্য, অপরটি দুর্গতির। সরকার ওই দ্বিতীয় সাম্যের পক্ষপাতী। সেটা বুঝলাম, তবে মন্ত্রীদের একজন যে সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, প্রাইভেট স্কুলে গরীবরা পড়ে, সরকারী স্কুলে ধনীরা—এটা শুনে যে একটা জিজ্ঞাসার উদ্রেক হলো তার জবাব পেলাম না : তাহলে কিণ্ডারগার্টেন, মিশনারী স্কুল, টিউটরিয়াল হোম—এসব জায়গায় কারা পড়ছে আজকাল? গরীবেরা বুঝি? গাড়িতে চড়ে যায়?

শুনলাম (আশা করি সত্য নয়) বাজেটের ধাক্কায় কাগজের দাম বাড়বে। বাড়লে শিক্ষার যে চমৎকার সুবিধা হবে সে তো বলাই বাহুল্য।

যাক গে, শিক্ষা-বিরোধীরা কেবল নাচোলে নয়, ঢাকাতেও আছেন। প্রাতঃস্মরণীয় এক লীডারের খবর জানি, শিক্ষার জন্য অনেক কাজ করে যশস্বী হয়েছেন, কিন্তু নিজ এলাকায় একটি স্কুলও তৈরি করেননি। উল্টো বাধা দিয়েছেন। জ্ঞানী লোক, জানেন ঠিকই যে খাল কাটলে কুমির আসবে। চোখ ফুটলে নানা জায়গায় চোখ দেবে, ভ্রুকুটি করবে, পানি না ঝরিয়ে আগুন ঝরাবে। প্রাতঃভ্রমণে পুরানো ঢাকার একজনের সঙ্গে দেখা হয় আমার। বড় দুঃখ করেন। ঢাকার স্থানীয় লোকদের লেখাপড়া হয়নি। হবে কি করে? শিখতে তো দেয়া হয়নি। নিজে তিনি জীবন শুরু করেছিলেন গুরগুল্লা বিক্রি দিয়ে। কি করবেন, পেটে তো বিদ্যা ছিলো না। নিজের পরিশ্রমে, আল্লার রহমতে এবং আমাদের দোওয়ায় এখন অবস্থা ভালো, খারাপ না। এখন একটাই উদ্বেগ তাঁর সার্বক্ষণিক। ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখানো। মানুষ করা। তাঁর সঙ্গের অনেকে এখনো ওই গুরগুল্লাই বিক্রি করছে। আর যারা দুটো পয়সা করতে পেরেছে তাদের ওই একটাই ধান্ধা—কি করে আরো পয়সা করা যায়। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছে দ্রুত, ছেলেদের বসিয়েছে এনে গদিতে। স্কুল শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেনি। না ছেলের ক্ষেত্রে, না মেয়ের। বলেন তিনি বড়ই আক্ষেপে। কি করে হবে? কি করে শিক্ষা পাবে লোকেরা? মস্ত বড় বড় লোক ছিলেন এই শহরে, কওমের লীডার তাঁরা, প্রাতঃস্মরণীয় সব ব্যক্তিত্ব, নিজেদের ছেলেমেয়েদের তাঁরা ঠিকই পড়ালেন—কলকাতায় পাঠিয়ে। কিন্তু অন্যদের বেলায় কি ব্যবস্থা? কাউল্লা, গইনা, দোলারা—ওরা কি করবে? কেন, ঘোড়ার গাড়ি আছে চালাক; সাহেবদের দালান তৈরির কাজ আছে, করুক, না পারলে মুদির দোকান খুলুক একটা—নয়তো গুরগুল্লার। তারপর রেস খেলুক গিয়ে মাঠে, সিনেমা-বায়স্কোপ দেখুক হলে বসে, কুস্তি করুক আখড়ায় আখড়ায়। লেখাপড়া? কি দরকার? একটা প্রাইমারী স্কুলও কি খুলেছেন তাঁরা? বলতে পারবেন? বলতে গিয়ে উত্তেজিত মতো হয়ে পড়েন তিনি। আমি তাকাতে সাহস পাই না। মনে হয় থু থু ফেলেন মুখ ঘুরিয়ে।

ঢাকায়-নাচোলে ব্যবধান নেই। একই অবস্থা। একদিকে অশিক্ষা, অন্যদিকে কুশিক্ষা। শরিয়ত, ধর্ম, তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ—অনেক কিছু আনা হয়, মানুষকে বিভ্রান্ত করবার জন্য।

এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির ইতিহাস লম্বা ইতিহাস। একটি প্রবন্ধ পড়ছিলাম বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা চেতনা ও রাষ্ট্রভাষা চিন্তার ওপর। দেখি ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে বিভ্রান্তি। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম বলেছেন, ''যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী/ সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।' যে বাঙালী বাংলা ভাষা পছন্দ করে না সে বেজন্মা—বলেছেন এই কবি। তাতো বুঝলাম, কিন্তু এই যে এই কঠিন ভাষা, এ কেন প্রয়োগ করলেন ওই কবি? নিশ্চয়ই বাধ্য হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তেমন লোক সমাজে বিস্তর ছিলো যারা হিংসা করতো বঙ্গবাণীকে। সপ্তদশ কেন বিংশ শতাব্দীতেও কি তারা ছিলেন না? নেই কি এখনো? অন্যদের কথা কি বলবো, স্বয়ং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, অতবড় খাদেম বাংলা ভাষার, তিনিও দেখছি ১৯১৮তে বলেছেন ''আমাদের যুগের চরমপন্থীরা এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, বাঙ্গালা শুধু আমাদের মাতৃভাষা নহে, উহা আমাদের জাতীয় ভাষাও বটে।--- এই মত একেবারে অযৌক্তিক, আমাদের সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ।'' না, বাংলা নয়, জাতীয় ভাষা হচ্ছে আরবী। প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৪৮-৪৯ সালে ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহও বলেছেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আরবী হওয়া উচিত। তাঁর বলার অবশ্য একটা কারণ ছিলো। তিনি চাইছিলেন উর্দুর হাত থেকে বাঁচতে। আরবীর পক্ষে বলা ছিলো একটি রণকৌশল। তা বুঝলাম, কিন্তু জনসাধারণের তো অতো কিছু জানার কথা নয়, জানাবার উপায়ও ছিলো না, তারা শুধু জানলো, বাংলা নয় আমাদের রাষ্ট্রভাষা হওয়া দরকার আরবী। কে বাঁচাবে তাদেরকে বিভ্রান্তির হাত থেকে?

কেউ কেউ আছেন বিভ্রান্ত করবার জন্য যে বলেন তা নয়, বলেন মজ্জাগত দাসত্ব থেকে। বহু যুগের গোলামী মনের গভীরতম প্রদেশে পৌঁছে গেছে, তাকে উৎপাটিত করা বড়ই কঠিন। নইলে বাঙালী কবি গোলাম মোস্তফা কেন বলতে যাবেন পাকিস্তান কায়েম হবার পর পরই যে, ''১৫ই আগষ্টের পরে পাঞ্জাবীরা যদি বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না হতো তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের দশা কি হতো, চিন্তার বিষয়।'' অবশ্যই। নইলে আমরা 'প্রভু' পেতাম কোথায়? কবি সে কথাটাই বলেছেন, প্রভুর ঘরে বসে দাসের আত্মনিয়ন্ত্রণের কোনো মানে হয় না। চিরকাল দাস থাকতে হবে বাঙালীকে, সে কেন রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা চাইবে? দাসেরা অনেক সময় প্রভুর পাহারাদারও বটে।

মন্ত্রীদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁদেরকে সেরব কথা বলতেই হবে যা তাঁরা বলেন। সেজন্যেই মন্ত্রী থাকেন, সরকার যায় আসে, তাঁরা থাকেন। (মন্ত্রীদের জন্য বিশেষ পাড়া তৈরি হচ্ছে, আমরা বরঞ্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব দেবো।) এককালে সমাজতন্ত্রের কথা বলে বলে গলা ভেঙ্গে ফেলেছেন এমন মন্ত্রীকে দেখি এখন ব্যক্তিমালিকানার মহিমা গাইছেন। তা গাইতে হবে বৈকি। (তোমার কাজ তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি!) এই যে নতুন বাজেট এসেছে এতে ৩৭১ কোটি টাকার নতুন কর বসবে গরীব মানুষের কুঁজো পিঠের ওপর। দাম বাড়বে গ্যাসের, বিদ্যুতের, চিনির, চায়ের, ভাড়া বাড়বে রেলের, খরচ বাড়বে ডাকটিকিটের, ফি লাগবে হাসপাতালে, কর বাড়বে ভূমি উন্নয়নের, কিন্তু মন্ত্রীরা ঠিকই বলবেন সমস্বরে যে এবাজেট জনকল্যাণের, বলবেন, এর যারা বিরোধিতা করে তারা সবাই হচ্ছে এককেটি মতলববাজ।

বলতে থাকবেন। সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবেন, আবার হবেনও না। সাধারণ মানুষ কি বলবো, আমাদের মতো খবরের কাগজটাগজ পড়ার ও লেখার মানুষেরাইতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি সময় সময়। যেমন, ধরুন, ওই যে মার্গারেট থ্যাচারের 'ঐতিহাসিক' বিজয় নিয়ে। এখানে দেখছি অনেকেই উল্লসিত। খুব ভালো হয়েছে, বেড়ে হয়েছে, লেবারের মুখে চপেটাঘাত পড়েছে। পড়ে ভুলে যাবার দশা হয় যে, মার্গারেট থ্যাচার আমাদের মতো কৃষ্ণবর্ণের মানুষদের মোটেই বন্ধু নন, পারলে তিনি তাদেরকে এই মুহূর্তেই বের করে দেন এবং ওই যে বেচারা লেবার পার্টি তাদের দুর্দশার একটা কারণই হলো তাঁরা বর্ণবাদবিরোধী এবং তাঁরা একটি ঐতিহাসিক কাজ করেছেন, এই প্রথমবার একজন নয়, দুজন নয়, পাঁচপাঁচজন কৃষ্ণবর্ণের সদস্যের জন্য বসবার স্থান করে দিয়েছেন পার্লামেন্টে। এইসব সাদামাটা সত্য ভুলিয়ে ছাড়েন খবরের কাগজের কোনো বিজ্ঞ কোনো লেখক। তবে সাধারণ মানুষের আরেকটি শিক্ষক আছে। সে হচ্ছে জীবন। জীবনই ওয়াজেদ মোড়লদের শিখিয়ে দেবে বিপরীত সারিতে গিয়ে দাঁড়াতে, আরো বড় সমাবেশ গড়ে তুলতে, এবং সেইসব প্রশ্ন তুলতে বিভ্রান্তকারী ও সুবিধাভোগীরা যেগুলোকে যমের মতো ভয় করে। মানুষ এগুবেই। তাইতো দেখছি একদিকে সরকার যেমন নির্বিকারভাবে আপন নীতি অনুসরণ করে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি বিরোধী দলের সদস্যরা তাঁদের প্রতিবাদকে সংসদে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজপথে চলে আসছেন। মিছিল করছেন, হরতাল ডাকছেন। মেরুকরণ অনিবার্য, যদিও দোদুল্যমানরা আছেন, এবং তাঁরা দুলবেনও।

মানুষ এগুবেই। আমরাও পারি এই এগুনোতে সাহায্য করতে, আর কিছু না হোক পাড়ার বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করে, হয়তো বা সেখানে দ্বিতীয় শিফট চালু করে, যেখানে বিদ্যালয় নেই সেখানে একটি বিদ্যালয় গড়ে তুলে, হয় তো বা একটি সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে। ইলা মিত্র না হতে পারি, দায়িত্বশীল মানুষ হবো না কেন?